আজকের পরিস্থিতিতে গ্রামীন ও কুটীর শিল্প
(গান্ধী চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে)

সুপ্রিয় মুন্সী

প্রখ্যাত আমেরিকান কবি রর্বাট ফ্রস্টের একটি কবিতা আছে যেখানে তিনি বলেছেন যে বনে যাবার দুটি পথ আছে যার একটি সকলেই ব্যবহার করে, কিন্তু অন্যটিতে কেউই যায় না, কেবল একজনই গেছেন ও সেখানেই প্রভেদ।

আজকের যুগটি গতি ও যন্ত্রের যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আজ কেউ যদি ক্ষুদ্র, গ্রামীণ, কুটির শিল্পের কথা বলেন তবে আমরা শুধু বিস্মিতই হইনা, তাকে বিদ্রুপ বানে জর্জরিত করি, তাকে নস্যাৎ করতে উদ্যত হই, যদিও জানি যে যন্ত্র ও গতি আমাদের অনেক মানবিক ও সামাজিক সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি বা সকলের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারেনি বা আত্মমর্যাদা নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার বন্দোবস্তও সকলের জন্যে করতে পারেনি। অন্ততঃ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, তার সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিস্থিতি যে ইঙ্গিত দেয় তা যে আমাদের অনেকেরই চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়।

প্রকৃতই আমরা যদি সামান্য ধৈর্যবান ও সহনশীল হই আমরা লক্ষ্য করব যে বর্তমান ব্যবস্থা উৎপাদনকে আরও কেন্দ্রীভূত করছে, প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের কথা চিন্তা না করে উন্নয়নের নামে ক্রমশঃ প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নিঃশেষিত করছে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করছে, সহজ পরিচালন যোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলিকে (গ্রাম) বিনষ্ট করে বড় বড় শহর সৃষ্টি করছে, (প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের মার্টিন তাঁর ‘আফ্রিকায় হিংসা’ বইটিতে লিখছেন, “আমরা নিশ্চিত জানি যে শহর করা, নির্মমভাবে শহরগুলিতে জনগণের কেন্দ্রীভূত হওয়া, হিংসার সৃষ্টি করে। অপরাধের পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করে, অতিরিক্ত শিল্পায়নের নামে, আরও মুনাফার জন্যে, বৃহদায়তন শিল্প সৃষ্টি করছে, তার কুফলগুলি অন্য পরিণামের কথা চিন্তা করছে না এবং অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়ের তাগিদে অন্যরকম উপনিবেশ, তথাকথিত তৃতীয় / চতুর্থ বিশ্ব সৃষ্টি করছে, যুদ্ধ, হানাহানি, বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ঘটার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করছে।” (বিশ্ববিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী পিতিরিম সোরোকীন তাঁর ‘মানবতার পুর্নগঠন’ বইটিতে লিখছেন, “যুদ্ধের ক্ষতগুলি থেকে রক্তাক্ত ও আণবিক বোমা নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দ্বারা ধ্বংস প্রাপত হবার আশঙ্কায় ভীত মানবসত্তা মৃত্যুফাঁদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে আপ্রাণ পথ খুঁজছে। তার এই রোবট বা যান্ত্রিক সভ্যতার রক্তাক্ত কম্বলের পরিবর্তে তার দেহের জন্যে আরও ভালো মানবতা, আরও প্রজ্ঞা, আরও উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক আবরণের স্বপ্ন দেখছে।”

একথা অবশ্য জোর দিয়েই বলা যায় যে যন্ত্র ও গতির বিরোধী কেউই নয়, গান্ধীজী ত ছিলনই না। বরং প্রয়োজনে ও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি মালিকানা বা কোন একটি গোষ্ঠী মালিকানায় নয়, রাষ্ট্রের অধীনে ভারী শিল্পেরও সমর্থন গান্ধীজী করেছিলেন। রাষ্ট্রের অধীনে কারণ যে উদ্বৃত্ত বা মুনাফা হবে তা কেবল একজন বা একটি গোষ্ঠী ভোগ করতে পারবে না, সকলের কাজে তা নিয়োজিত হবে। তিনি বলছেন, “যন্ত্রের বিরোধী আমি নই, কিন্তু যন্ত্র আমাদের দাস করবে তার বিরোধি আমি সম্পূর্ণই।.....আমি এর নিয়ন্ত্রণ চাই।..... আজ যন্ত্র কয়েকজনকে লক্ষ লক্ষ জনকে শোষণ করার সুযোগ করে দিয়েছে।..... কিন্তু প্রধান বিবেচ্য ত মানুষই। যন্ত্র মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চালনা করতে দেয় না।.....সহজ, সরল যন্ত্রপাতি যা’ লক্ষ লক্ষ মানুষের

ভার লাঘব করে তাকে আমি স্বাগত জানাই।.....বৈজ্ঞানিক সত্য ও আবিষ্কার গুলির কেবলমাত্র লোভের হাতিয়ার হওয়া থেকে বন্ধ হতে হবে.....।" ভূপাল, চেরনোবিলের গ্যাস দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর এই চিন্তাগুলি কি খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়? ১৯৩৫ সালে কোন একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে তিনি কি মনে করেন। উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে সকলের উপকার ও কল্যাণের জন্যে যে আবিষ্কার তাকে তিনি সবসময়েই পুরস্কৃত করবেন, যেমন সিঙ্গার সেলাই কল। কিন্তু শ্বাসরোধকারী কোনো গ্যাস যা একেবারে শত শত মানুষকে মেরে ফেলে তাকে তিনি কখনোই সমর্থন করেন না। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলাকে তিনি বলেছিলেন - 'Most diabolical use of Science' (বিজ্ঞানের আত্মহননকারী রূপ) (গান্ধীজীকে আমরা অনেকেই ভুল বুঝেছি। লেলিন যখন তাঁকে প্রকৃত বিপ্লবী বলে স্বাগত জানান তখন তাঁকে আমরা অন্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি)। বস্তুতঃ গান্ধীজী আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর বড় দুটি কারণ তিনি rigid ছিলেন না এবং সব সময়েই তাঁর growth হয়েছে। প্রকৃত intellectual বা বিদগ্ধ ব্যক্তির যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমরা অনেকেই জানি যে গান্ধীজী এক বিকেন্দ্রিত সমাজের চিন্তা করেছিলেন যেখানে 'হিংসা' বা শোষণের কোনরকাম সুযোগ থাকবে না, (গান্ধীজীকে এই জায়গাতেও আমরা ভুল বুঝেছি। 'হিংসা' বলতে মুখ্যত যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন তা হল সব রকমের শোষণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও dominance বা আধিপত্য যা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে খর্ব করে ও যারা দুর্ব্বল ও সমাজের নীচের তলায় পড়ে আছে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'দরিদ্র নারায়ণ', তাদের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। অহিংসা ঠিক এর বিপরীত-শোষণহীনতা, তন্ত্র-মুক্তি ও non-dominance বা অনাধিপত্য, অর্থাৎ সহযোগী রাষ্ট্রচিন্তা, প্রতিযোগী নয়), প্রত্যেকে তার লোভ বা আকাঙ্খা মত নয় ("প্রত্যেকের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট আছে কিন্তু লোভ বা আকাঙ্খার জন্যে সামান্যই আছে" - গান্ধীজী), প্রয়োজন মতই সব কিছু পাবেন এবং এই সমাজ স্থাপনের অত্যন্ত বাস্তব ও প্রকৃষ্ট উপায় তিনি তাঁর জীবন, কর্মধারা ও চিন্তার মাধ্যমে আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। তাঁর এই চিন্তার গঠনের সময়ে আমদের দেশের ও প্রাচ্য সমাজের গঠন এবং প্রকৃতি, যা প্রধানতঃ ছিল কৃষি ও গ্রামভিত্তিক, যেখানে অন্ততঃ আপাতভাবে সকল প্রাণী ও মানুষের সামাজিক ও সামগ্রিক মূল্য ছিল বেশী, সেই সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের দেশের কোটি কোটি বেকার, অর্ধনগ্ন, অনাহার-ক্লিষ্ট, রোগগ্রস্ত শিশু ও মানুষ, যাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিলেয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁদের কথাও তাঁর মনের গোড়ায় সব সময়ে থাকত। এছাড়া আমরা জানি যে এমন একটি শক্তি ও কাঠামোর সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল যা আমদের এই সামাজিক ভিত্তি ও মূল্যবোধকেই শেষ করে দেয় নি, সর্বপ্রকার শোষণে আমাদের নিষ্পেশিত করেছিল ও দারিদ্রের চরম সীমায় আমাদের ঠেলে দিয়েছিল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন সর্বকালে, সর্বদেশে এই শোষণকারী কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে মূলতঃ দুটি শক্তির সাহায্যেই এই শোষণকারী ও শোষণকামী কাঠামো বেঁচে থাকে এবং সেইজন্যে কোনো কোনো সময়ে অসহযোগ, স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের ডাক তিনি দিয়েছিলেন। এর জন্যে এক বিশেষ কার্যক্রমের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন যা তাঁর গঠনমূলক কার্যক্রম বলে পরিচিত। এই কার্যক্রম তাঁর উভয় চিন্তারই পরিপোষক ছিল - যে কোনো শোষণকারী ব্যবস্থা ও কাঠামোর মূলোচ্ছেদ ও নতুন শোষণহীন সমাজ স্থাপন যেখানে মানুষ স্বমহিমায় ও স্বকীয়তায় বেড়ে উঠবে ও বিরাজ করবে।

গান্ধীজীর এই যে Scheme of things বা পরিকল্পনা এতে ক্ষুদ্র, গ্রামীন ও কুটির শিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য এই শিল্পগুলির নিজস্ব অনেক সুবিধাও রয়েছে।

মোটামুটিভাবে এই শিল্প বলতে আমরা সেই শিল্পকেই বুঝি যা একজন বা তার নিকটস্থ কয়েকজন মানুষ তার বা তাদের শরীর শ্রমের মাধ্যমে অল্প পুঁজিতে, অল্প সময়ে, অল্প স্থানে ও অনায়াসে কেবলমাত্র প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন করতে পারে এবং এর gestation period বা কালও খুব কম। তাছাড়া এই শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল গ্রামে বা নিকটস্থ স্থানেই পাওয়া যায় এবং এর জন্যে বাজার খোঁজারও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া এই শিল্পে মানুষের প্রকৃত involvement হয় এবং শিল্পে মানব-সভ্যতা বিধ্বংসী কোনো উৎপাদন সম্ভব নয়। আমরা জানি যুদ্ধাতঙ্কের দিনে কেন্দ্রীভূত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা মারাত্মক হতে পারে। বস্তুতঃ যুদ্ধের সময়ে গান্ধীজীর প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্যতম ছিল বিকেন্দ্রিত এই উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ। কয়েকটি শহর ও বৃহৎ শিল্পকে অনায়াসে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু স্বনির্ভর, সুস্থ পাঁচ লক্ষ গ্রামকে ধ্বংস করা সহজ কথা নয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতা বলে কেবলমাত্র অভাবগ্রস্ত কাঠামোই অন্যায় ও শোষণের সঙ্গে হাত মেলায়।

এই শিল্পগুলির আর একটি বড় সুবিধা হল 'চাকুরী সৃষ্টি' (employment generation)। আজ ত সারা বিশ্বের তাবৎ চিন্তাবিদ্ এর মূল্য স্বীকার করেছেন, এমন কি নিকট অতীতে হিটলার জার্মানীতে একটি সময়ে এই শিল্পের উৎসাহবর্ধন করেছিলেন ও ইন্দোনেশিয়ার পরলোকগত রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ তাঁর দেশে জনসংখ্যার হার প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেলেও দ্বিগুণ জনসংখ্যা চেয়েছিলেন (গুণার মির্‌ডাল, 'এশিয়ান ড্রামা')। সমবন্টন ও প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদনের সবকটি রাস্তা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে জনসংখ্যা সম্পদেও পরিণত হতে পারে। এছাড়া এই শিল্প মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য তাদের সমস্ত পুষ্টিগুণ ও খাদ্যগুণ ধরে রাখতে পারে।

অবশ্য আমরা কি এই সম্বন্ধে সচেতন নই? সজাগ বলেই সুম্যেকার 'ক্ষুদ্রই সুন্দর' বই লেখেন, 'জাতীয় সংহতি' যা আজ প্রত্যেকের আলোচনার বিষয় তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একই বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহেরু যখন কেন্দ্রীভুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা আরও উৎপাদনের কথা বলেন (কারণ সঠিক বা বেঠিক মূল্যায়ণ হোক, তাঁর মনে হয়েছিল যে অধিক শিল্পায়ন ও উৎপাদনের দ্বারাই পশ্চিমী দেশগুলি তাদের দারিদ্রের যথাযথ মোকাবিলা করতে পেরেছে) তখন তিনিই অসম অর্থ-নৈতিক বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, যা আজ সংহতির পথে বাধাস্বরূপ, তাদের দূর করতে গিয়ে বিকেন্দ্রিত গ্রামীন ও কুটির শিল্পের দিকে জোর দেন।

আসলে যন্ত্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা নয়, সামঞ্জস্য আনতে হবে ও এমন যন্ত্রেরও কেন্দ্রীভূত উৎপাদন সমর্থিত হবে, যা মানুষকে শেষ করে ফেলবে না, শোষণের স্বীকার করবে না, স্বাধীন, স্বাবলম্বী বৃত্তি কেড়ে নেবে না ও তার সুস্থ বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে অপ্রজনীয় অবকাশ সৃষ্টি ও হিংসা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করতে পারে ।

বস্তুতঃ নতুন শতব্দীর শুরুতেই আমাদের স্থির করতে হবে আমরা কি করব। প্রতিযোগিতা না সহযোগিতা, সকলের দ্বারা প্রয়োজন ভিত্তিক উৎপাদন না বহুল উৎপাদন, মানবিক বৃত্তিগুলির পরিপুরক ও পৃষ্ঠপোষক ও অহিংস ও শোষণহীন সমাজ স্থাপন (পরলোকগত প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুগত দাসগুপ্ত মহাশয় যাকে 'নৈতিক সমাজ' বা 'Moral Society' বলেছেন), না হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি! একবিংশ শতাব্দী যেন মানুষ ও মানবিক বৃত্তিগুলির হত্যার নীরব দর্শক না হয়!